কোভিড-১৯ বিশ্বমারি মোকাবিলাতে টিকা ও বাংলাদেশ

মুশতাক হোসেন

কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। নতুন ভাইরাসের জিনগত বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করার এক বছর কম সময়ের মধ্যেই এর বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কার হয়েছে। সর্বশেষ (২৫/০২/২২) খবর অনুযায়ী ৯টি টিকা এ পর্যন্ত মানবদেহে প্রয়োগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদন দিয়েছে। মানবদেহে পরীক্ষা হচ্ছে ১৪৬টি টিকা, প্রাণিদেহে পরীক্ষা হচ্ছে ১৯৫টি টিকা। বাংলাদেশে ১টি টিকা প্রাণিদেহে পরীক্ষা শেষে এখন মানবদেহে পরীক্ষার অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখ্য, টিকাগুলো কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে শতভাগ কার্যকর না হলেও বা গোষ্ঠীগত প্রতিরোধ (পপুলেশন ইমিউনিটি) গড়ে না তুললেও তা নিশ্চিতভাবেই মানুষকে গুরুতর অসুস্থতা থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে।

আবিষ্কৃত টিকাগুলোর উৎপাদনকারী দেশ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যখন একের পর এক টিকার অনুমোদন দিতে থাকে, তখন থেকেই বাংলাদেশ টিকা আনার প্রস্তুতি নেয়। বাংলাদেশ সরকার প্রধানতঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) প্রথম থেকেই বিশ্বব্যাপী টিকার সমবন্টনের ওপর জোর দিয়ে আসছিল এবং সে উদ্দেশ্যে বৈশ্বিক টিকা সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য কোভ্যাক্স গঠন করে। এর আগে সেপি (কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রিপ্যারডনেস ইনোভেশনস) এ উদ্যোগ শুরু করলে বাংলাদেশ শুরুতেই এতে চাঁদা প্রদান করে। সেপি পরে কোভ্যাক্সে যুক্ত হয়।

শুরু থেকেই টিকা উদ্ভাবনকারী দেশগুলোর বেশীর ভাগই তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি ছিল না। তবে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীগণ ঘোষণা দেন যে, তারা তাদের টিকা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করবে না। শুধু তই নয়, তারা ব্রিটেন ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন দেশে এর ক্লিনিব্যাল ট্রায়াল ও উৎপাদনের অনুমতি দেয়। তারা মধ্য ও নিম্নআয়ের দেশগুলোতে আয় অনুযায়ী হ্রাসকৃত মূল্যে টিকা সরবরাহ করবে বলে ঘোষণা দেয়। এ ধরণের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ অন্যান্য নিম্নও মধ্য আয়ের দেশের মতই অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকোর টিকা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুবিধা ছিল প্রতিবেশ দেশ ভারতে এ টিকার ক্লিনক্যাল ট্রায়াল ও উৎপাদনের সুযোগ। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট ঝুঁকি নিয়ে টিকার তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হতেই টিকা উৎপাদনে শুরু করে। অন্যান্য দেশে টিকা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এর ফলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের সাথে সাথে এটা মানবদেহে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, দ্রুততম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ এ টিকাগুলো ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে। যা ছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে বাংলাদেশের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর মাধ্যমে টিকা সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শুরুটা ভালই হয়েছিল। কিন্তু ভারতে কোভিড-১৯ বিশ্বমারি ডেল্টার ভয়াবহ বিস্তারের কারণে ভারতের নিজস্ব চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশে সেরামের টিকা সরবরাহ স্থগিত হয়ে যায়। সারা বিশ্বে ডেল্টার প্রকোপ বিস্তৃত হয়। ফলে বিকল্প কোনো উৎস থেকে টিকা সংগ্রহ করতে বাংলাদেশের কিছুটা সময় লাগে। এরপর প্রধানতঃ চীন থেকে বাংলাদেশে সিনোফার্ম ও সিনোভ্যাকের টিকা সরবরাহ শুরু হয়। এটাই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোভিড-১৯ টিকার সবচেয়ে বড়ো উৎস। এরপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভ্যাক্স ও বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ধরণের টিকা আসতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে পুনরায় টিকা সরবরাহ শুরু হয়। এখন বাংলাদেশে টিকার প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা নেই। সারা বিশ্বে এখন চাহিদা অনুযায়ী টিকা উৎপাদন হয়েছে, যদিও অন্ততঃ ২৫টি দেশে এখনো টিকা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা থেকে দূরে রয়েছে। প্রধানতঃ প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতি, টিকা সংরক্ষণের সমস্যা, প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এ সব দেশ এখনো পিছিয়ে আছে।

আমরা এখন টিকা পাচ্ছি, কিন্তু কতটা ন্যায্যতার সাথে পাচ্ছি সেটা এখনো অজানাই থেকে যাচ্ছে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা কোনো কোনো টিকার ক্ষেত্রে। কোভ্যাক্সের মাধ্যমে আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে অনুদানের মাধ্যমে টিকা পাচ্ছি। কত খরচ হচ্ছে সেটা জানা যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী অতি উচ্চ আয়ের দেশগুলো উচ্চমূল্যে, মধ্যম

আয়ের দেশগুলো মাঝারী মূল্যে এবং নিম্নআয়ের দেশগুলো সর্বনিম্নমূল্যে টিকা পাচ্ছে কোভ্যাক্স থেকে। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোনো কোনো দেশ থেকে আনা টিকার মূল্যটা জানা যাচ্ছে না। কারণ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী দেশ তাদের বিবেচনা অনুযায়ী একেকটি দেশকে একেক দামে টিকা সরবরাহ করছে। এটা তাদের জন্য স্পর্শকাতর কূটনৈতিক বিষয়। তবে কোভ্যাক্স থেকে যে নীতিমালা অনুযায়ী যে ধরণের মূল্যে বাংলাদেশ টিকা পাচ্ছে সে নীতিমালা অনুসৃত হলেই ভাল।

পাশ্চাত্যের দেশ থেকে আসা মডার্না ও ফাইজারের টিকা অতি শীতল তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়, বিশেষ করে ফাইজারের টিকা -৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও মডার্নার টিকা -২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ হামের টিকার জন্য অতি শীতল তাপমাত্রার (-২০ থেকে -৫০ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড) সংরক্ষণাগার জেলা পর্যায়ে থাকলেও সেটা ফাইজার টিকার জন্য অতটা শীতল নয়। শুধু সংরক্ষণই নয়, ঢাকার অতি শীতল সংরক্ষণাগার থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পরিবহনের জন্যও অতি শীতল তাপমাত্রার ফ্রিজারযুক্ত যানবাহন দরকার। এদেশের কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা করছে। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের অব্যাহত সহযোগিতা তো রয়েছেই। এ মুহূর্তে বাংলাদেশে অতি শীতল তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণের তেমন বড়ো কোনো সমস্যা নেই। দেশের প্রতিটি জেলাতেই প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারো বছর থেকে আঠারো বছর বয়সী সকলকে ফাইজারের টিকা দেয়া হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন পর্যন্ত বারো বছর থেকে সতের বছর বয়সীদেরকে কেবলমাত্র ফাইজারের টিকা দেবার বৈজ্ঞানিক অনুমোদন দিয়েছে।

টিকা প্রদান শুরুর আগে যখন এদেশে টিকা এসে পৌঁছেনি, তখন মানুষের মধ্যে বড়ো ধরণের আগ্রহ ছিল টিকা নিয়ে। মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসা ছিল কেন টিকা আনা যাচ্ছে না! কিন্তু যখন টিকা এসে পৌঁছাল তখন টিকার চাহিদা কমতে শুরু করল। এক টিকার বিরুদ্ধে আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী টিকা কোম্পানীর বিরূপ প্রচারণা, বিজ্ঞানে আস্থাহীন রক্ষণশীল গোষ্ঠীবিশেষের অপপ্রচার, কুতথ্য প্রচার প্রভৃতি টিকা গ্রহণে মানুষের ভাটার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এটা বলা দরকার যে, এ সব প্রচার প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে এদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে পৌঁছায়। তবে দেশের ভেতরেও এধরণের অপপ্রচারের উদ্যোগ ছিল। এ ধরণের ভাটার পরিস্থিতির মাঝে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে টিকা সরবরাহ স্থগিত হল সেখানে বিশ্বমারি পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করাতে। তখন আবার চাহিদা বাড়তে থাকল। কয়েক মাস পরে বাংলাদেশ টিকা সংগ্রহে সমর্থ হল। মানুষের চাহিদা ও আগ্রহে আর তেমন ভাটা পড়েনি। তবে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী টিকা গ্রহণের সুযোগ নিতে পারেনি একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত। এ জন্য মাঝে মাঝেই বিশেষ টিকা অভিযান পরিচালিত হয়েছে, যখন মানুষ ইলেকট্রনিক নিবন্ধন ছাড়াই সরাসরি টিকা দিতে পেরেছে। তখন মানুষের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে টিকা কেন্দ্রগুলোতে।

এ ধরণের সর্বশেষ টিকা প্রদানের অভিযান হয়ে গেল গত ২৬ ফেব্রুযারি ২০২২ শনিবার। লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক দিনে এক কোটি টিকা প্রদানের। মানুষের প্রচন্ড আগ্রহে সে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ঐ দিন এক কোটিকে ছাড়িয়ে আরো প্রায় বারো লক্ষ মানুষ টিকা নিয়েছেন। মানুষের আগ্রহ বিবেচনায় নিয়ে তারপরেও দু'দিন ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি টিকা অভিযান অব্যাহত ছিল। টিকার প্রথম ডোজ দেশের সমগ্র জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। এখন সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে টিকার দ্বিতীয় ডোজেও ৭০ শতাংশ অতিক্রম করা।

তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, যদিও টিকাগুলো কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে শতভাগ কার্যকর নয়, কিন্তু গুরুতর অসুস্থতা ঠেকায়, তাই টিকা কর্মসূচী আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সংক্রমণ ঠেকাতে শতভাগ কার্যকর টিকা হাতে না পাই। সে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বিদ্যমান টিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে মেসেঞ্জোর আরএনএ। মডার্না ও ফাইজার এ প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীগণ এখন চেষ্টা করছেন এ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমন একটি টিকা তৈরি করা যেন তা দিয়ে সকল ধরণের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো যায়। এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর বদলে যাওয়া নানা ধরণ (ভ্যারিয়্যান্ট) ও উপধরণকেও (যেমনঃ আলফা, বিটা, ডেল্টা, ওমেক্রন, ওমেক্রন বিএ২) যেন ঠেকানো যায় সে চেষ্টা চলছে। একে প্যান করোনাভাইরাস বা প্যান সারবিকোভাইরাস টিকা বলা যেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে দক্ষিণ আফ্রিকাতে মেসেঞ্জোর আরএনএ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে টিকা উৎপাদনের একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেখান থেকে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ এ প্রযুক্তি প্রয়োগ টিকা উৎপাদনের পথে এগাচ্ছে। বাংলাদেশকেও একই ধরণের সহযোগিতা করা হবে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠান মেসেঞ্জোর আরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিকা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মানবদেহে এ টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হবার পথে। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দাবি করেছে, সাধারণ ফ্রিজের ঠান্ডার তাপমাত্রাতেই (৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) এটি সংরক্ষণ করা যাবে। এাট আমাদের জন্য আশার খবর।

টিকার পাশাপশি সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে কোনো প্রকার শিথিলতা দেখানো হবে বিপদজনক। ষাট বছরের বেশী বয়সী, শরীরের ওজন বেশী, দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস-উচ্চ রক্তচাপ-ক্যান্সার-শ্বাসকষ্ট-কিডনী প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় ভুগছেন ও এ রোগ নিয়ন্ত্রণে নেই, কেমোথেরাপি বা ডায়ালাইসিস চলছে - শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল রয়েছে এমন অবস্থায় আছেন তারা কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য রোগের জন্যও ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিসহ সবাইকেই স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে। কারণ কম ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ কোভিড-১৯ ভাইরাস বহন করে অতি ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে সংক্রমিত করতে পারেন। যারা এখন সুস্থ আছেন তারা নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম বিশেষ করে শ্বাসের ব্যায়াম করে শরীরকে রোগ প্রতিরোধী করে গড়ে তুলতে পারেন। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে। খাবারে অতিরিক্ত চিনি, লবণ ও তেল বাদ দিতে হবে। কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত হবার পরে বিভিন্ন ভিটামিন ঔষধাকারে সেবন করে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদগ্রীব হন কেউ কেউ, যেটা খুব একটা কাজে দেয় না। সে আকাঙ্খা কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত হওযার আগেই পূরণ করা উচিত। তাহলেই সেটা কাজে দেবে। তবে ভিটামিন ঔষধের মাধ্যমে সেবন না করে খাবারের মাধ্যমেই সেবন করা উচিত। যাদের শরীরে সুনির্দিষ্ট ভিটামিনের অভাব আছে বলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শে তারা সে নির্দিষ্ট ভিটামিন খেলে কাজে দেবে। নতুবা তা অপচয় ও কোনো ক্ষেত্রে শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

আমরা একদিন কোভিড-১৯ বিশ্বমারি কাটিয়ে উঠবো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিশ্বমারি যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে গেছে সেটাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। সেটা হচ্ছে জনস্বাস্থ্যকে কেন্দ্রে রেখে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিকশিত করা। কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থা হবে এর কেন্দ্রবিন্দু। এ জন্য গ্রামাঞ্চলের মত বড়ো বড়ো শহরেও এলাকাভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে। এভাবে আমরা যদি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাই, তাহলে বাংলাদেশে করোনা বিশ্বমারি মোকাবেলায় যতটুকু অপূর্ণতা দেখা গেছে তা আমরা পূরণ করতে পারবো। ভবিষ্যৎ বিশ্বমারি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

#

লেখক - উপদেষ্টা, রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)

০৬.০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার